মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

বিপ্লব হালিম-এর

৭২তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

ও

বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান প্রদান

(২য় বর্ষ)

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গণতন্ত্র। বহুত্বের ভারতে 'এক দেশ এক সংস্কৃতি' যে উন্নয়নের কাণ্ডারী হতে পারে না সেই উপলব্ধি থেকেই রচিত দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান, যেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি পরে যুক্ত হলেও, সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যেই প্রোথিত আছে, সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির মূল দিকনির্দেশ। স্বাধীনতার ৭৩তম বছরে তাই বহু তুফান অতিক্রম করেও, ভারত বিশ্বের দরবারে এক উন্নয়নশীল, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র হিসেবে সম্মানের আসনে আসীন।

'নানা ভাষা, নান মত, নানা পরিধানের' ভারতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখতে একসময়ে সরকারের যেমন সদর্থক ভূমিকা ছিল, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে দৈনন্দিন জীবনে, পরমত সহিষ্ণুতার জন্য, ধর্মের নামে রাজনীতি থেকে মানুষকে বিরত করতে ও শান্তি এবং সম্প্রীতির নজির গড়তে নিরলস ভাবে কাজ করেছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মীরা; তাঁরা সাধারণ মানুষকে উদবুদ্ধ করেছেন মানবতার মন্ত্রে ও ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চারা এঁরাই আজীবন সিঞ্চিত করেছেন, কথায় ও কাজে। প্রয়াত মানবাধিকার সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী বিপ্লব হালিম ছিলেন এঁদেরই একজন।

শৈশবেই ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠ তাঁর নিজের বাড়িতে, পিতা আবদুল হালিমের হাত ধরে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবদুল হালিম, যিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পথিকৃত ছিলেন, ব্যক্তি জীবনে আদ্যোপান্ত নাস্তিক হলেও চিরকাল পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। শোনা যায় সদ্য স্বাধীন ভারতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতার অলিগলিতে তিনি নির্ভয়ে ঘুরতেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে। তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবল থেকে বহু অনামী মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন বলেও কথিত আছে।

সেই উত্তাল সময়েই কলকাতায় জন্ম বিপ্লব হালিমের। জন্মসূত্রেই যেন অর্জন করেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্র। পরবর্তীতে তার পরিবারই যেন এক ক্ষুদ্র ভারত, বৈচিত্রে ও ঐক্যে।

মা অশ্রুকণা হালিম, জন্মসূত্রে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হলেও দীক্ষা নিয়েছিলেন কমিউনিজমের মন্ত্রে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। নিজের দিদিমা, যিনি ছিলেন খ্রিষ্টধর্মপ্রচারিকা, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে ওঠেন বিপ্লব হালিম। তবে আশৈশব ধর্মের বেড়াজালের ঊর্দ্ধেই।

কৈশোর থেকেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততা তাঁর যুক্তিবাদী মননকে আরো ক্ষুরধার করে। যৌবনে গতানুগতিক গদি সর্বস্ব রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, মেহনতী মানুষের লড়াইয়ে সক্রিয় ভাবে যোগ দেন তিনি। মানুষের সাথে পথ চলতে চলতে তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পাঠ। আরো নিবিড়ভাবে মানুষের মধ্যে কাজ করার জন্য দলীয় রাজনীতি ছেড়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ইমসে নামের এক সামাজিক সংগঠনের, আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে। প্রত্যন্ত গ্রামের গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষকে অধিকার নিয়ে সচেতন করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নয়, ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার সংগঠনের কাজ প্রসারিত করেছিলেন। বিপুল সে কর্মযজ্ঞে একদিকে যেমন ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার উন্নতি সাধনের কাজ, তেমনি মানুষকে সমাজ সচেতন করা, পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির বাঁধন দৃঢ় করা ও শান্তির প্রসার ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই উদ্দেশ্যে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন লোকসংস্কৃতি দল। গ্রামে গ্রামান্তরে মানুষের কাছে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা তারা পৌঁছে দিতেন সহজ ভাষায়, লোকজ রীতি ও গানের মাধ্যমে।

বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী বিপ্লব হালিম, বীরভূম হিতৈষী নামের এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। তার সম্পাদকের কলমে বার বার ধরা পড়েছে শান্তি ও সম্প্রীতির কথা। ধর্মকে জনতার আফিম বলেই বিশ্বাস করতেন তিনি, কিন্তু নিজের মত জোর করে অন্যের উপর চাপানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন বিপ্লব হালিম। বিশ্বাস করতেন গঠনমূলক আলোচনায় ও সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর।

দেশে যখন সাম্প্রদায়িক হাওয়া গরম হতে শুরু করে, তখন তিনি বিশিষ্ট সমাজবিদ্‌দের সাথে নিয়ে স্থাপনা করেন PANNICH বা People's Action

Network for National Integration and Communal Harmony. এই সংগঠন একাধিক বই প্রকাশ থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য বহুবিধ কাজ করেছে এবং এখনো ছোট আকারে হলেও সেই কর্মকাণ্ড অব্যাহত। শিখদের বিরুদ্ধে হওয়া দাঙ্গা থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পথে নেমে, মানুষের মাঝে গিয়ে সম্প্রীতির বাঁধনকে শক্ত করেছেন বিপ্লব হালিম। তাই বর্তমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সংকটকালে আরো বেশি করে মনে পড়ে এই কর্মযোগীকে, যিনি মানুষের সাথে মানুষের মনকে সাম্যের গানে বেঁধে গেছেন, অনাড়ম্বর ভাবে। ভঙ্গী সর্বস্বতাতে তার কোনদিনই বিশ্বাস ছিল না।

আজ দেশে সাম্প্রদায়িক বিষ যখন রাজনীতির মূল রসদ, যখন সাধারণ মানুষও সেই অফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে, প্রতিনিয়ত নিজেই নিজের মানবাধিকারকে পদদলিত করছে, যখন যুদ্ধের উন্মাদনায় শান্তির বাণী ভুলুণ্ঠিত, যখন শান্তি ও সম্প্রীতিকামী মানুষদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে নানা উপায়ে, তখন বিপ্লব হালিমের মত এক দরদী জননেতার অভাব শূণ্যতাবোধের আরেক নাম। তবে চির আশাবাদী বিপ্লব হালিম, তার কঠিন কর্মময় জীবনে কোনদিন হাল ছাড়েননি। তাঁর পরিবার আর সহকর্মীরা, যারা তাঁর আদর্শে দীক্ষিত এখন তাদের পালা সেই বিপ্লবের পতাকা বহন করে চলার। নিরহংকার, সদালাপী বিপ্লব হালিমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেটাই সেরা শ্রদ্ধার্ঘ্য।

তাঁর ৭২তম জন্মদিবসে (১৯৪৭-২০১৭) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শীর্ষক আলোচনা সভার সাফল্য কামনা করি।

উজ্জয়িনী হালিম

উজ্জয়িনী হালিম
ইমসে

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে

ডাঃ সন্মথনাথ ঘোষ

সভ্যতার আদি পর্বে মানুষ বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে অবলোকন করল প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য, তাণ্ডব, অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার আবার খাদ্যের অপ্রতুলতা, দুর্ভিক্ষ, বন্যজন্তুর আক্রমণ, আবার সেই পশুকে বশীভূত করে কাজে লাগানো, মানুষের নানা রোগ ও মৃত্যু অবার সুঠাম দেহ। প্রকৃতির এই বৈপরিত্য তার মনে জন্ম দিল গোটা ব্যবস্থার কোন নিয়ন্ত্রকের ধারণা। যার সন্তোষ অসন্তোষের উপর নির্ভর করছে পরিস্থিতি। ঐ শক্তিকে তুষ্ট করতে পারলেই সে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে আর জীবন হবে সাবলীল। সে এই শক্তির নাম দিল ভগবান। তার কল্পিত ভগবানকে তুষ্ট করবার জন্য পূজাপার্বণ, যাগযজ্ঞ ও নানাবিধ নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ হল। এই প্রক্রিয়ার নাম হল ধর্ম। সমাজের কিছু বুদ্ধিমান মানুষ এই ধারণাকে পুষ্ট করল। দাবী করল তারা হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও জনগণের যোগসূত্র। ফলে লাভবান হল ঐ বুদ্ধিমানেরা আর বাকি মানুষেরা পেল বেঁচে থাকার ভরসা। Albert Einstein তার Science and Religion নিবন্ধে বলেন, "with primitive man it is above all fear that evolves religious notions-fear of hunger, wild beasts, sickness, death. Since at this stage of existance, understanding of casual connections is poorly developed. The human mind creates illusory beings more or less analogous to itself on whose wills and actions these fearful happenings depend. Thus one tries to secure the favour of these beings by carrying out actions and offering sacrifices which according to the tradition handed down generation propitiate them or make them well disposed towards a mortal. In this sense I am speaking of a religion of fear.

মানব সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষ ধীরে ধীরে যাযাবর জীবন থেকে স্থিতিশীল হল। কতকগুলি মানবিক মূল্যবোধকে আশ্রয় করে গড়ে তুলল সমাজ। মূল্যবোধগুলি প্রসারের জন্য প্রয়োজন হল তার নৈতিক শক্তির বিকাশ। তার ধারণা হল মানুষের জীবন প্রকৃতির দান। একে নিয়ন্ত্রণ করছে এক বৃহৎ শক্তি যার নাম ঈশ্বর। মানুষের মধ্যে আছে পশু শক্তি ও শুভশক্তি। ঈশ্বর পশুশক্তির মত আচার আচরণের জন্য তিরস্কৃত আর নৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য পুরস্কৃত করেন। আইনস্টাইন এই ধর্মের নাম দিয়েছেন Religion of morality. ধর্ম যখন যুক্তি দ্বারা চালিত হয় তখন তার মনন শক্তির বিকাশ ঘটে এবং সে অমিত শক্তির অধিকারী হয়। অবশ্য যার এই শক্তি ধারণ ক্ষমতা আছে সে-ই এই শক্তির উপলব্ধি করতে পারে, Einstein একেই Cosmic religion বলেন, তিনি মনে করেন cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research. বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন বলেন, "Religion on the other hand deals with evolution of human thought and action. It can not justifiedly speak of facts and relationship between facts. তার মতে

বিজ্ঞান হল Science can ascertain what is, not what should be.

রবীন্দ্রনাথ তার "Religion of Man" গ্রন্থে বলেন, I do not imply that the final nature of the world depends upon the comprehension of the individual person. Its reality is associated with the universal human mind which comprehends all lives and possibilities of realisation. And this is why for accurate knowledged of things. We depend upon science that represent the rational mind that represent the universal plan and not upon that of the individual who dwells in a limited range of space and time and the emmigrated needs of life. We must realise the reasoning mind but also the creative imagination love wisdom that belong to the supreme person সমাজকে ধরে রাখতে মানুষের নৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে, সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে, (যার ভিত্তি হবে সহযোগিতা, সৌভ্রাতৃত্ব, নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচতে সাহায্য করো প্রভৃতি মূল্যবোধগুলি) কিছু প্রবল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কিছু নীতিমালার রচনা করেন ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে যাতে মানুষে এইসব নীতিমালা গ্রহণ করে। নিজেকে দাবি করেন ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বা সন্তান বলে, ঐ সময়কার প্রেক্ষাপটে ঐ অতিমানবের নামের সঙ্গে যুক্ত করে প্রচারিত হয় ধর্মমত যেমন হজরত মহম্মদকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম। আবার অনেক মনীষির মতের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটা ধর্ম - অবশ্য সকলের মতের উৎস হচ্ছেন ঈশ্বর। যেমন সনাতন ধর্ম। কিন্তু এই সব প্রবক্তাদের উপলব্ধি সম্যক বুঝে ওঠা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী হল আচরণ বিধি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা অলিখিত নিয়ম কানুন। একই ধর্মমতে বিশ্বাসী লোকদের নিয়ে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটা সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের একটা মতাদর্শ থাকে, প্রথম দিকে ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্য। পরবর্তীতে ধর্মের মূল আদর্শ গৌণ হয়ে যায়। আচার আচরণ নিয়ম বিধিই হয়ে দাঁড়ায় শেষ কথা, পুরোহিত শ্রেণী ও রাষ্ট্র ধর্ম ও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে নিজ স্বার্থে। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় ধর্ম ও তার সম্প্রদায়ের নামে যত অধর্ম ঘটছে তা সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যুদ্ধ, পুড়িয়ে মারা, লোক ঠকানো - এমন কোন ঘৃণ্য অপরাধ নেই যা ধর্মের নামে করা হয়নি। একই ধর্ম মতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর লড়াই যা রাজনৈতিক গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে হার মানিয়ে দেয়। ধর্ম যখন মানবতা বিবর্জিত হয়, যুগের প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম হয় তখনই ধর্মে আসে পচন, সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পায়। ধর্মের এই পরিস্থিতিতে আসে সংস্কার আন্দোলন। ইহুদী ধর্মের সংস্কার করেন যীশুখ্রীষ্ট। ইসলাম ধর্মে গড়ে ওঠে আলিগড় আন্দোলন, সুফি মতবাদ। সনাতন ধর্ম যখন কুক্ষিগত পুরোহিত শ্রেণীর হাতে তাকে মুক্ত করে যুক্তিনির্ভর ধর্ম গড়ে তোলেন গৌতম বুদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মে গতিবেগ আনেন শ্রীচৈতন্য ও ভক্তি আন্দোলনের মহারীথগণ। চৈতন্যদেব সমাজকে মানবতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। গন্ডীমুক্ত করে মধ্যযুগে মুসলমান ও হিন্দু ধর্মের বিরোধরেখাটি ঘোচাতে সচেষ্ট ছিলেন। চৈতন্য দেবের আহ্বানে সঙ্কীর্ণ খণ্ডতাকে অতিক্রম করে বাঙালি একেবারে বিশ্ব চেতনার পথে এগিয়ে গিয়েছিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ও অন্যান্য ভক্তিবাদী মহারথীদের

আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মূলত আবেগকে কেন্দ্র করে। তাই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই আন্দোলন ছিল ইতিহাসে মূলত একটা স্ফুলিঙ্গের মতো। বেশী দিন এই আন্দোলন স্থায়ী হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই সমাজ আবদ্ধ হয়ে পড়ে ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক তমসার ভয়ঙ্কর নাগপাশে। হিন্দু ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভোজবাজি, সর্বপ্রাণবাদে যা ঈশ্বর ও কুসংস্কারের এক সংমিশ্রণ। পূজার স্থান নিয়েছিল পশুবলি, ধর্মীয় ক্রিয়াচার প্রভৃতি। ধর্ম ছিল ব্রাত্য। মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ধর্মের নাম করে পুরোহিতরা করতেন না এমন কোন অপকর্ম নেই।

যে নীতিমালা নিয়ে ধর্ম গড়ে উঠেছিল তা উপেক্ষিত হয়ে আচরণ বিধিই শেষ কথা হয়ে যায়, অন্ধবিশ্বাস হয় চালিকা শক্তি। সমাজ তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। যুক্তিবাদ ও ধর্মের বিশ্বজনীনতা এই বৌদ্ধিক মানদণ্ডকে হাতিয়ার করে ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাঁচার তাগিদায় ১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। ব্রাহ্মসমাজের শাখা ছড়িয়ে পড়ে ভারতে। তারপর আর্য্য সমাজ, প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন প্রান্তে। মুসলিম সমাজে আহমদিয়া আন্দোলন, আলিগড় আন্দোলন, মহারাষ্ট্রে সত্য সাধক সমাজ, কেরালার শ্রী নারায়ণ ধর্ম প্রতিপালন সভা প্রভৃতি। এই সব সংস্কারকরা অতীতের অন্ধ পুনর্জীবন চাননি। তারা ইতিহাস গ্রহণ করেছেন যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে। সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলন যে সাংস্কৃতির মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছিল তা ছিল মূলত জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার এক অপরিহার্য্য অংশ। এই আন্দোলনের প্রাথমিক ভাবে বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটাবার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। এটা ছিল ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শগত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অঙ্কন। জাতীয়তাবাদীরা ক্ষাত্র শক্তিকে জাগ্রত করতে ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করেন। কালী ছিল সেদিন তাদের কাছে শক্তির প্রতীক। বিপ্লবী মানসিকতার উন্মেষে শক্তির উৎস। অনেক জাতীয়তাবাদী একে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান বলে মনে করতেন, ফলে মুসলিম জনগণের একাংশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে থাকে।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতা মানুষকে দিয়েছে অফুরন্ত ভোগের সামগ্রী কিন্তু কেড়ে নিয়েছে স্বস্তি, মানসিক প্রশান্তি। সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতা। আজকের উৎপাদন ব্যবস্থার রসদ হল মানুষের আকাঙ্খার বিস্ফোরণ। অনিয়ন্ত্রিত ভোগ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। অতৃপ্ত মানুষ হয় নেশা জুয়ার শিকার। নৈতিকতা মানবতা হল মনের দুর্বলতা। Survival of the fittest হল এই ব্যবস্থার দর্শন আর নৈতিকতা মানবতা বিবর্জিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়েছে ধর্ম।

সাম্প্রদায়িকতা একটা মতাদর্শ। এই মতাদর্শ গড়ে ওঠে কিছু ভ্রান্ত ধারণাকে ভিত্তি করে। মনে করা হয় একই ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষদের ধর্ম বর্হিভূত সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ অভিন্ন। এই ধারণা থেকেই গড়ে উঠেছে ধর্মীয় সম্প্রদায় ভিত্তিক গোষ্ঠী। পরবর্তীকালে মনে

করা হত এক ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক স্বার্থগুলি অপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ থেকে আলাদা ও ভিন্নমুখী। এটাই হল সাম্প্রদায়িকতার ২য় পর্যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুগামীদের স্বার্থগুলো পরস্পর বিরোধী। তাদের এক সঙ্গে খাপ খাওয়ান অসাধ্য। তাদের স্বার্থ একে অন্যের বিরোধী। এই অবস্থা হল সাম্প্রদায়িকতার তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায়ে এদের স্বার্থের সমন্বয় সাধন অসম্ভব। এই পর্যায়ে গড়ে উঠে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত জাতীয়তা। যেমন হিন্দু জাতি, মোসলমান জাতি প্রভৃতি। রাজনৈতিক ফায়দা তোলবার জন্য গড়ে তোলা হয় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যথা হিন্দু মহাসভা, মোসলেম লীগ ইত্যাদি।

১৮৭৫ সালের আগে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়াই করেছিল হিন্দু মোসলমান সব ধর্মীয় লোকেরাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। সেই সময়কার কৃষক আন্দোলনে সব ধর্মাবলম্বী কৃষকেরা সামিল ছিল। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনেও সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না। রামকৃষ্ণ সব ধর্মের সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছেন। বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন রূপ দিতে সচেষ্ট ছিলেন। সৈয়দ আহমেদ খাঁ মুসলিম ধর্ম সংস্কারের কথা বলেন। তিনিই ছিলেন আলিগড় আন্দোলনের প্রবক্তা। ১৮৮৪ সালে তিনি বলেছিলেন 'আপনারা কি এই দেশে বাস করেন না! এখানেই কি আপনাদের পোড়ানো বা কবর দেওয়া হয় না। হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় শব্দ ছাড়া কিছুই নয়। যারাই এদেশে বাস করেন তারাই এলেন এক কৌম বা জাতি-র অন্তর্ভূক্ত। উপনিবেশিক শাসকেরা আমাদের দেশে তাদের শাসন কায়েম করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাবার প্রতিশ্রুতি দিলো। কালো আদমিদের সভ্য করা হল সাদা চামড়ার মানুষদের দায়বদ্ধতা। এই তত্ত্ব প্রথম দিকে কিছুটা কার্যকরী হলেও ৮০ দশকেই এই অতিকথন আর কার্যকরী ছিল না। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় ভাইসরয় লর্ড ডালহৌসী ও ইউ.পির গভর্ণর কলভিন হিন্দু মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে উঠেন। তারা মোসলমানদের কংগ্রেসে যোগ না দিতে প্ররোচিত করতে সচেষ্ট হন। অবশ্য বিপুল সংখ্যায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মোসলমান যুবকেরা কংগ্রেসে যোগ দেন। উল্লেখ্য উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত মোসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা বয়কট করেন আর হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে প্রশাসনে উচ্চপদে বহাল থাকেন। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল বিভাজন। এই বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ তার 'ভাগ কর ও শাসন কর' তত্ত্ব কার্যকরী করেন। আলিগড় আন্দোলনের প্রবক্তা সৈয়দ আহমেদ খাঁ ও তার অনুগামীরা এই ফাঁদে পা দেন। তারা সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাদের তখন বক্তব্য হল হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে অথবা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হলে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। এই পরিস্থিতিতে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পর মোসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা রাজানুগত্যের রাজনীতি অনুসরণ করে। ১৯০৭ সালে তারা সারা ভারত মোসলেম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। আগা খাঁ, বড় বড় জমিদার, ঢাকার নবাব প্রভৃতি উচ্চবিত্ত মুসলমানেরা। লীগ ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব

সমর্থন করেছিল। তুলেছিল স্বতন্ত্র মুসলিম স্বার্থের স্লোগান। দাবী করেছিল স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলীর। চাকুরী ক্ষেত্রে আইন সভায়, পৌরসভায় মুসলিম সংরক্ষণ।

মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণে তারা সচেষ্ট ছিল যাতে শিক্ষিত মোসলমান যুবকেরা কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ না দেয়। কিন্তু তাদের আশা অবশ্য পূরণ হয়নি। ২০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত মোসলমান যুবকেরা জাতীয়তা বাদী আন্দোলনে বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল।

অনুরূপভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রকট হয়ে উঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা বলতে থাকেন মধ্যযুগের মোসলমান শাসকদের অত্যাচার থেকে হিন্দুদের রক্ষা করেছে ব্রিটিশ। তাই হিন্দুদের ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা উচিত। তারা হিন্দী ভাষা ও গো হত্যা নিবারণকে কেন্দ্র করে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা গড়ে তুলতে তৎপর হন। ১৯০৯ সালে ইউ এন মুখার্জী ও লালচাঁদের নেতৃত্বে পাঞ্জাব হিন্দুসভা গঠিত হয়। লালচাঁদ বলেন তিনি প্রথমে হিন্দু পরে ভারতীয়। ১৯১৫ সালে কাশিম বাজার মহারাজার সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। তাদের অভিযোগ ছিল কংগ্রেস মোসলমানদের তোষণ করে হিন্দু স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে। তারা আইনসভায় ও সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দু হিস্যার জন্য ছিল তৎপর, তাদের কাছে ব্রিটিশ শাসন ছিল আশীর্বাদ।

হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠার ফলে জমিদার উচ্চবিত্ত মানুষেরা এই সংগঠন হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই সময়ে মোসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে না ওঠায় জমিদার ও জায়গিরদাররা মুসলিম সমাজের বড় অংশকে নিয়ন্ত্রণ করত। উপনিবেশিক শাসকেরা মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সর্ব প্রকারে সাহায্য করে চলল। মোসলমান সংগঠনের দাবী তৎক্ষণাৎ মেনে নেওয়া হয়। হিন্দু, মোসলমান, শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের ব্যবহার করা হয় আলাদা জাতি হিসাবে। হিন্দু মোসলমান শিখ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয় সাধন করে ভারতীয় জাতিসত্তা গড়ে তোলবার প্রয়াসকে বাধা দেওয়া হয় প্রতি পদে। ১৯০৬ সালের আগা খাঁ প্রমুখের স্বতন্ত্র নির্বাচক মন্ডলীর দাবী সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেওয়া হয়। ১৯০৭ সালের মর্লি মিন্টো সংস্কার পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা দাবী মেনে নিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন দৃঢ় করা হয়। সরকারী চাকুরী, আইন সভা, পৌরসভা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে দৃঢ় করে। সাম্প্রদায়িক পত্র পত্রিকাকে মদত দেওয়া হয়। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী পত্র পত্রিকার উপর দমন পীড়ন চালান হয়। দাঙ্গার সময় সরকার নিস্ক্রিয় থেকে মোসলমান দাঙ্গাবাজদের প্রশয় দেয়।

৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রাক্কালে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। বাংলায় সাম্প্রদায়িক শক্তি মোসলেম লীগ হিন্দু মহাসভা যুক্তভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করে ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রয়াসকে সম্পূর্ণভাবে মদত দেয়। বাংলায় লীগ সরকারের মাধ্যমে তার সংগঠন তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করে। সারা ভারতে ১৯৪৬ সালে আইন সভার নির্বাচনে লীগ বিপুল সংখ্যায় জয়ী হয়। মুসলিম লীগ মোসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

ধর্মের মূল নীতিকে উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িকতা গড়ে উঠে, ধর্ম প্রতিষ্ঠার সময়ে সমাজের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে যে সব আচরণবিধি নিয়ম রচিত হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে

পরবর্তীতে পুরোহিত ও মোল্লারা ঐ নিয়মনীতির ব্যাখ্যা দেন তাদের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে। আজকের সাম্প্রদায়িকতা হল তাদের ব্যাখ্যার প্রতিফলন। তাই দেখা যায় একজন পরম ধার্মিক কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক নন, যেমন মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, খান আব্দুল গফ্‌ফর খান। আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির অবিসম্বাদী নেতা হলেন মহম্মদ আলি জিন্না, তাকে মুসলিম ধর্মচারণের অবশ্যকরণীয় নামাজ পড়তে দেখা যায় নি। তার খাদ্য তালিকায় মুসলিম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ (হারাম) শুকরের মাংস অবশ্যই থাকত। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীকে দৈনন্দিন জীবনে ধর্মাচরণ করতে দেখা যায় নি। খাদ্যের ব্যাপারে তার কোন ছুৎমার্গ ছিল না। লালকৃষ্ণ আদবানী রাম সেজে অযোধ্যা কান্ড ঘটালেন তার গৃহকোণে ধর্মের কোন জায়গা নেই। কিন্তু ধর্মাচরণ করি না করি সব ধর্মের থাকে প্রচন্ড আবেগ। এই আবেগকে ভর করে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার ঘুটি সাজান। এই ব্যাপারে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুত্বের ধ্বজাধরা আর.এস.এস. ও মোসলেম সাম্প্রদায়িকতাবাদী জামাতের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তারা সবাই একসূত্রে বাধা, ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় গতিশীল সমাজে সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পায় না সমাজ যখন গতি হারায় তখনই পশ্চাৎপদ সংস্কৃতির প্রতিভূ সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পায়। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে তারা সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। সম্প্রতি হিন্দুদের নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানাতে মা কালীর ছবি পোষ্ট করেছেন। এই হল তার হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞান, অথচ তিনিই হলেন হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী। হিটলারী ঢং-এ গোয়েবেলসের নীতি অনুসরণ করে বিশ্ব ধনতন্ত্রের ক্রীড়নক নরেন্দ্র মোদি সরকার হিন্দু সমাজকে চরম মুসলমান বিদ্বেষী করতে সচেষ্ট। তাদের মনে অলীক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেন যে মুসলমানরা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবে। কাশ্মীরে সন্ত্রাস দমনের নামে হিটলারী ঢং-এ চলছে আগ্রাসন। গোটা কাশ্মীরকে আজ বন্দীশালায় পরিণত করা হয়েছে। আর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সারা দেশে চলছে সামরিকীকরণের মহড়া, স্বনিয়ন্ত্রিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী দলের বার্তাবহ করে তোলা হচ্ছে। এইসব পদক্ষেপ কিসের ইঙ্গিত বহন করছে পাঠকই তার বিচার করুন।

সমাজ সভ্যতা এগিয়ে চলেছে আপন ছন্দে। সমাজের দেহে মনে চলেছে নিরন্তর রূপান্তর সকলের অলক্ষ্যে। বিশ্বযুদ্ধের পর উৎপাদন ক্ষেত্রে আসে ব্যাপক পরিবর্তন, অর্থনীতি ক্ষেত্রে আসে ধনতন্ত্রের সুবর্ণ যুগ। বামপন্থী প্রগতিশীল আন্দোলনে আন্দোলিত হতে থাকে গোটা বিশ্ব। সেদিন গোটা মধ্য প্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ভাসছিল প্রগতিশীল বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ারে। সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব সেদিন ছিল না এই সব দেশে। আমাদের দেশে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল কিন্তু গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় ও আত্মত্যাগে ভারত হল ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। পূর্ব পাকিস্থানে ধর্মের আবেদন থেকে ভাষার আবেদন প্রাধান্য পেল। সৃষ্টি হল ভাষার ভিত্তিতে একটা স্বাধীন দেশ। কিন্তু ৭০-এর দশকের গোড়াতেই চাহিদার অভাব দেখা যায়, মন্দা মানুষ হারায় তার নৈতিকতা, সমাজে দেখা দেয় অবক্ষয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, সমাজ দেহে ধরে পচন।

সোভিয়েটের পতন মাও-এর চায়না বাজার অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। হো চি

মিনের ভিয়েৎনাম হয়ে দাঁড়ায় মার্কিনদের মৃগয়া ভূমি, গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে রক্ষণশীলদের থেকেও রক্ষণশীল হয়ে উঠে। মতাদর্শের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিরাট শূণ্যতা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আসে মন্দা যার শেষ আজও দেখা যাচ্ছে না। ধনতন্ত্রের শেষ সম্বল ফ্যাসিবাদ আজ প্রকট হয়ে উঠেছে দেশে দেশে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গত শতাব্দীর ৩০-এর মন্দা জন্ম দিয়েছিল জার্মানীতে ইতালিতে ফ্যাসিবাদের, ফ্যাসিবাদের বাহন হল সাম্প্রদায়িকতা।

মানব সভ্যতা আজ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে দেশে দেশে প্রকৃতি হচ্ছে বিপর্যস্ত। মানুষ মানুষকে পণ্য করছে। হারাচ্ছে তার মনুষ্যত্ব। প্রতিরোধ যাতে না গড়ে উঠে তার জন্য পশ্চাৎপদ সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতার কুহকে আচ্ছন্ন করা হচ্ছে গোটা সমাজকে। সামরিকিকরণ, নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করা হচ্ছে মানুষ মারার জন্য। উগ্র জাতীয়তাবাদকে মদত দিতে ঘটছে ফ্যাসিস্ট শক্তির পুনরুত্থান।

আজ পাকিস্তান থেকে নাইজেরিয়া সমগ্র মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় একই ধর্মের ২ সম্প্রদায়ের লড়াই চলছে যুগ যুগ ধরে। কত লক্ষ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। কত লক্ষ মানুষ আজ অমানুষের মত দিন কাটাচ্ছে শরনার্থী শিবিরে তবুও যুদ্ধ চলছে কার স্বার্থে?

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ধনতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতার সূচনা হয়েছিল আজ আর তার কিছু দেবার নেই। তার ধ্বংস অনিবার্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ধ্বংসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নয়া সভ্যতার বীজ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিই একদিন ঘটাবে নয়া সভ্যতার অরুনোদয় হয়ত এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।

আজকের সঙ্কটের ধারক হল সাম্প্রদায়িকতা। সমাজ বিবর্তনের গতি রুদ্ধ করে এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। এটা একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে নাগরিক সমাজ। আর সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি হল কিছু ভ্রান্ত ধারণা। এই ধারণাকে পরিস্ফুট করেছে ধর্মীয় আবেগ ও অন্ধবিশ্বাস।

সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা দাবী করেন একই সম্প্রদায়ের মানুষদের ধর্ম-বর্হিভূত বিষয়গুলিও যেমন - অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ অভিন্ন। ধারণাটা একেবারেই ভিত্তিহীন। একজন পাঞ্জাবী মুসলমান জমিদার ও বাংলার একজন মুসলমান কৃষকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ নিশ্চয় অভিন্ন নয়। একজন পাঞ্জাবী হিন্দু মহাজন ও একজন মুসলমান জমিদারের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ নিশ্চয় একই সূত্রে গাঁথা। একই মেসিনে কাজ করা একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান শ্রমিকের অর্থনৈতিক স্বার্থ কি এক নয়? তাই এই ভুল ধারণাকে দূর করতে নাগরিক সমাজকে বৌদ্ধিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ধর্ম যখন যুক্তি হারায় তখন তা ফসিলে পরিণত হয়। যুগের প্রয়োজন মেটাতে ধর্মের আচরণ বিধিকেও পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিবর্তন করতে পারে নাগরিক সমাজ। পশ্চাৎপদ সংস্কৃতি জন্ম দেয় সাম্প্রদায়িকতা। সমাজের গতি যখন রুদ্ধ হয় তখনই সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য পায়। সমাজকে গতিশীল করতে পারে সৃষ্টিশীল মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি।

২০১৯-র সম্মানিত সমাজসেবিকা

সাবিনা ইয়াসমিন

সমাজের পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত, অসহায় মানুষের কাজ করার প্রবল তাগিদ আর মহৎ উদ্দেশ্য, এই দুটোকে মূলধন করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের কোনও প্রতিকূলতা কিংবা বাস্তবের কঠিন চ্যালেঞ্জ, কোনকিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনা। সৎ প্রচেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁরা খুঁজে নেয় সঠিক দিশা এবং উত্তরণ।

সাবিনা ইয়াসমিন হলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘির এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রাম্য পরিমন্ডলে বড়ো হওয়ার সময় থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, গ্রামের মানুষেরা অনেকরকম সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কাজকর্মের সুবিধা কিছুই তারা পান না। এমন কী পানীয় জলের অভাবে নানা অসুখ বিসুখের তারা শিকার। গ্রামের পিছিয়ে পড়া খেটে খাওয়া মানুষের অতিকষ্টের জীবনযাপনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বলেই, অন্য কিছু একটা করার একান্ত আগ্রহ নিয়ে সেইসব মানুষদের বিপদে আপদে পাশে থাকার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্যও কেঁদে ওঠে তাঁর মন। আদিবাসী মানুষদের বেঁচে থাকার দুর্দশা তাকে খুব কষ্ট দিত। কষ্ট পাওয়া থেকেই স্বপ্ন দেখতেন কীভাবে তাদের পাশে থেকে তাদের জন্য ভালো ভালো কাজ করা যায়। সরকারী বেসরকারী স্তরে যে সব সুযোগসুবিধা তাদের জন্য বরাদ্দ আছে, সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে ছোটাছুটি করে তাদের সেই সব সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কাজে সবসময় নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তোলেন।

ভৌগলিক কারণে যে সমস্ত মানুষেরা পাহাড়ের নিচে কিংবা জঙ্গল ঘেরা দূরবর্তী এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেন, সেইসব এলাকার বাচ্চাদের মূলস্রোতে ফেরানো, মানসম্মত পড়াশুনো, বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী, বৃক্ষরোপণ ও সৃজনশীল কর্মসূচী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের মধ্যে এক অন্যরকম উদ্দীপনার আবহ তৈরী করে চলেছেন। কর্মসূত্রে যেখানে যেখানে তিনি থেকেছেন সেখানেই শুরু করেছেন পিছিয়ে থাকা দূর্বল মানুষদের আলোর দিশা দেখানোর কাজ।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সুপরামর্শ ও আশীর্বাদ তাঁর একমাত্র পাথেয়। কঠিন চ্যালেঞ্জের সময়ে যারা সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস এবং অনুপ্রেরণা জোগান, তারা হলেন, মা সুফিয়া বিবি, আব্বা মহিউদ্দিন শেখ, শিক্ষক এবং অভিভাবক শ্রী পার্থ

সেনগুপ্ত মহাশয়, শিস-এর ডাইরেক্টর এম. এ. ওয়াহাব সাহেব, শান্তি নোবেল জয়ী শ্রী কৈলাস সত্যার্থী স্যার, এন.আই.আর.ডি. হায়দ্রাবাদ-এর পূর্ববর্তী ডি.জি. এবং বর্তমান পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রী এম. ভি. রাও সাহেব এবং বিশিষ্ট সমাজদরদী ইকবাল তরফদার ও রাজীব লামা প্রমুখ। মানুষের সাহায্য করা বা মানুষের মঙ্গল সাধন করা নয়, মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করার অদম্য মানসিকতার এবং সাহসীকতার দৃষ্টান্ত রচিত হোক তাঁর এই কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে।

দুর্জয়কে জয় করার প্রত্যয়কে অটুট রেখে সাবিনা ইয়াসমিনের পথ চলাকে আমরা 'বিপ্লব হালিম স্মারক' সম্মান জানাই ও তাঁর আগামী পথ চলা যাতে সুগম হয় তাঁর জন্য জানাই শুভেচ্ছা।

২০১৯-র সম্মানিত সমাজসেবিকা

শ্রীমতী কল্যানী পালুই

শ্রীমতী কল্যাণী পালুই-এর জন্ম হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া-২ ব্লকের তুলসীবেড়িয়া গ্রামে। গ্রামেই বেড়ে ওঠা ও মাধ্যমিক পাশ। ছোটবেলায় গ্রামের মধ্যে বিদ্যালয় যাবার পথে দেখতেন রাস্তায় একাধিক চোলাই মদ তৈরীর ভাঁটি চলছে। এর ফলে এলাকায় মাতলামি, গালি-গালাজ গন্ডগোল, এক নিত্য ত্রাসের আবহাওয়া যেন চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিশোরী বয়সেই এই আবহাওয়া তাঁর ভালো না লাগলেও এর পরিবর্তন কিভাবে করা যায়, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ক্রমে কল্যাণী পালুই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন, দুই পুত্র সন্তানের জননী হলেন। এই সময়ে তাঁর স্বামী অকালে প্রয়াত হন। পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করতে তিনি যুক্ত হলেন সামাজিক সংস্থার কাজে। কর্মসূত্রে গ্রামের বাইরে হাওড়া কোলকাতা ইত্যাদি জায়গায় যাতায়াতের ফলে পরিচিত হলেন বাহির জগতের পরিবেশের সাথে। বুঝলেন তাঁর গ্রাম কতটা পিছিয়ে আছে।

ইতিমধ্যে তাঁর প্রতিবেশী এক পরিবারে, দাদার মৃত্যুতে শশ্মানে গিয়ে ভাইয়ের মাত্রাতিক্ত মদ্যপান এবং সৎকার কার্য শেষে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে সেই ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা তাঁকে প্রচন্ড ভাবে আঘাত করে। পাশাপাশি মদের নেশায় ঘটে চলা বউ মেয়েদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন তাঁর মনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত ভাবে লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা নির্যাতিত পরিবারের স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো শুরু করেন তিনি। মাদকাশক্তিই যে সংসারের অভাব অনটন

গার্হস্থ্য অশান্তির অন্যতম বড় কারণ, এটি তিনি ভালোমত উপলব্ধি করেন।

তাঁর এই চিন্তা চেতনা তিনি ছড়িয়ে দেন এলাকার গরীব, নির্যাতিতা মহিলা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিবারগুলির মধ্যে। ক্রমশ এই মানুষগুলি হয়ে ওঠে তাঁর সহকর্মী। এদের সাথে নিয়েই তিনি পেলেন পথ চলার শক্তি ও সাহস। সমাজের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে অগ্রণী মহিলাদের নিয়ে দল তৈরী করলেন, Resistance Group বা প্রতিরোধ বাহিনী তৈরী হল। যোগাযোগ করলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত, পুলিশ প্রশাসন, স্কুল শিক্ষক এবং ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এই উদ্যোগের বাস্তবায়ানে ২০০৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মাদকের কুফলের বিরুদ্ধে জন চেতনা গড়ে তুলতে সংগঠিত করা হল এক মহামিছিল। তৈরী হল তুলসীবেড়িয়া মহিলা প্রতিরোধ দল। ২০১১ সালে ৬০টি চোলাই মদের ভাঁটি উচ্ছেদ করা হল। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নানা বাধা, হুমকি ও মামলার মুখে পড়েও কাজ চালিয়ে গেছেন, অবিরাম। ভেঙ্গে দেওয়া ভাঁটিতে যাতে আবার মদ ব্যবসা গড়ে না ওঠে তার জন্য নিয়মিত ভাবে মহিলাদের সতর্ক পাহারা আর মিটিং মিছিলের আয়োজন করা হয়।

ইতিমধ্যে লাগোয়া ১০টি গ্রামে তাঁরা কাজের আরো প্রসার ঘটান, অকাল বৈধব্যের শিকার মহিলা ও দুঃস্থদের মধ্যে। মদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে সাথে, পুর্নগঠনের কাজে নামলেন তিনি। 'খানপুর গণ উন্নয়ন কেন্দ্র' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠন করলেন ও এই সংস্থার মাধ্যমে অসহায় মহিলাদের মধ্যে ছাগল পালন, জরির কাজ, ঠোঙা তৈরী, সবজি ব্যবসা আর দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ ইত্যাদি কাজের সূচনা করলেন। আর্ন্তজাতিক নারী দিবস, পরিবেশ দিবস, রাখি বন্ধন উৎসব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা সভা পদযাত্রার মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে এক অমোঘ সামাজিক বন্ধন ও অধিকার সচেতনতার লক্ষে কাজ করে চলেছেন তিনি নিরলস। তাঁর সংস্থা নির্যাতিতা মহিলাদের আইনী সহায়তা পেতে সাহায্য করে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য প্রচার করে থাকে। এছাড়া এলাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিষেবা ঠিকঠাক চলছে কিনা তাঁর খোঁজ রাখা, কোন দুর্নীতি হলে প্রতিবাদ করা, এসব তাদের রোজকার কাজ।

কল্যাণী পালুই তাঁর কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন যেমন গ্রামের মানুষদের ভালোবাসায় তেমনি ২০১৭তে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মাননীয়া শশী পাঁজার হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়াও Rotary Club of Calcutta, Nehru Yuva Kendra Howrah, উলুবেড়িয়া মহাকুমা সাহিত্য পরিষদ ও আরও অনেক সংগঠন থেকে পুরস্কার পেয়েছেন।

আজ তুলসীবেড়িয়া এলাকায় এখন আর একটিও চোলাই ভাঁটি চলে না, ছেলে মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যায়। তুলসীবেড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকায় মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করা গেছে। পাশাপাশি তিনটি ব্লকের মহিলারা আজ সংগঠিত। এ এক বড় জয়।

নৈতিকতার উত্তরণে নিশ্চয় একদিন নেশা ও হিংসামুক্ত সুস্থ সমাজের বিকাশ হবে, এই স্বপ্ন দুচোখে মেখে এগিয়ে চলেছেন কল্যাণী দৃঢ় পদক্ষেপে। তাঁর এই নিঃস্বার্থ জনসেবার প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা ও তাঁকে আমরা বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মানের মাধ্যমে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

২০১৯-র সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী শঙ্কর বেহেরা

শঙ্কর বেহেরার জন্ম উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার সাহাবাজিপুর গ্রামে, দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারে। ছোট থেকে অভাব ও বঞ্চনার সাথে তার পরিচয়, ছোট থেকেই শুরু বেঁচে থাকার লড়াই। দারিদ্রতা সত্ত্বেও তার মায়ের উৎসাহে প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ করেন শঙ্কর। এরপরে কৈশোরেই জীবিকার তাগিদে উত্তাল সমুদ্রে ছোট ডিঙি নৌকায় অন্যান্য প্রত্যন্ত মৎস্যজীবীদের সাথে রুটিরুজির খোঁজে পথ চলা শুরু।

কিন্তু আর পাঁচজন দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মত অভাব ও বঞ্চনাকে কপালের লেখা বলে কোনদিনই মেনে নেন নি শঙ্কর। বৈষম্য ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সবসময়েই অন্যদের সংগঠিত করার ও প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন নিজের উদ্যোগে, সীমিত ক্ষমতায়।

১৯৮০ সালে উড়িষ্যার বালীয়াপালে কেন্দ্রীয় সরকার একটি সামরিক ক্ষেপনাস্ত্র ঘাটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় যার ফলে প্রায় ১০০র বেশী উপকূলীয় মৎস্যজীবী ও কৃষকদের গ্রামগুলি উচ্ছেদ হবে বলে ঘোষণা করা হয়। লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকা যখন বিপর্যস্ত, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত, তখন বিপ্লব হালিম উড়িষ্যার ঐসব উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গড়ে তোলেন গণ প্রতিরোধ। এই উত্তাল সময়েই সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ শঙ্কর এক জনসভায় বিপ্লব হালিমের বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হন ও এক সামাজিক কর্মী হিসাবে জন সংগঠনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। গণ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি একাধিকবার কারাবরণও করেন।

এরপর কেটে গেছে বহু বছর, বিপ্লব হালিমের সান্নিধ্যে শ্রী শঙ্কর বেহেরা একজন প্রতিবাদী কিশোর থেকে ক্রমশ পরিণত হয়েছেন একজন অতি পরিচিত জননেতায়। উপরোক্ত অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনের ফলে সরকার ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কিন্তু শঙ্কর বেহেরার কাজ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। গরীব মানুষকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য, অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তাদের জোটবদ্ধ করার জন্য ও বিপদে আপদে সুখে দুঃখে সাধারণ মানুষের

পাশে দাঁড়ানোর জন্য, তাঁর ৩০ বছরের নিরলস সমাজসেবার জন্য আজ উড়িষ্যার মৎস্যজীবী ও কৃষক সমাজে তিনি সুপরিচিত ও সমাদৃত। মৎস্যজীবীদের নিয়ে গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়ন EAST COAST FISH WORKERS' UNION-এর তিনি আজ সাধারণ সম্পাদক ও দেশে তথা বিদেশে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের একজন পরিচিত নেতা। এছাড়াও নিজের উদ্যোগে আইন নিয়ে চর্চা করে আজ গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলিকে তিনি আইনী সাহায্যও প্রদান করেন।

নিজের আর্থিক সঙ্কট ও নানান পারিবারিক সমস্যা সত্ত্বেও, ৩০ বছর ধরে শঙ্কর বেহেরা সমাজসেবার নানাদিকে নিজের অবদান রেখেছেন, চিরকালই প্রচারের আলোর থেকে দূরে। শ্রী শঙ্কর বেহেরার কাছে বিপ্লব হালিম ছিলেন পিতৃতুল্য, তাঁর আদর্শেই আজও পথ হেঁটে চলেছেন তিনি। শ্রী শঙ্কর বেহেরার সারা জীবনের সমাজসেবামূলক কাজকে আমরা 'বিপ্লব হালিম স্মারক' সম্মান জানাই ও তাঁর ভবিষ্যত সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি জানাই আমাদের শুভ কামনা।

২০১৯-র সম্মানিত সমাজসেবক

শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র প্রামাণিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত মগরাহাট ১নং ব্লকের উস্থি থানার অধীন বরিজপুর গ্রামে জন্ম শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র প্রামাণিকের। ঐ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের শুরু। পরে উত্তরকুসুম হাইস্কুল (বাড়ী থেকে দু কি.মি. দূরে) থেকে স্কুল ফাইনাল পাস। তারপর ডায়মন্ডহারবার ফকির চাঁদ কলেজ থেকে পি.ইউ. বাংলা অনার্স সহ বি.এ এবং বি.এড ডিগ্রী অর্জন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ এবং পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ।

গ্রামে সালিশি বিচার, মীমাংসার নামে মোড়লতান্ত্রিক অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ২৯শে অক্টোবর ১৯৭২ সালে জনকল্যাণ সমিতির জন্মের তিনি ছিলেন অন্যতম কান্ডারী। সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে মহিলাদের যুক্ত করার জন্য ১৯৭৭ সালে গঠন করেন জনকল্যাণ মহিলা সমিতি। পরে উত্তরসূরী তৈরীর মানসে গঠন করা হয় জনকল্যাণ সমিতির জুনিয়র ইউনিট - ১৯৯৭ সালে।

জনকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র প্রামাণিক ও সহকর্মীরা দীর্ঘদিন যাবৎ জনসেবা মূলক কাজকর্ম করে আসছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৭৭ সালে কলকাতাস্থ শরিক (SAREEK) নামক সংস্থার সঙ্গে সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ করা। ঐ সময় মগরাহাট ১নং ব্লকের ৩০টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিয়ে গ্রামীণ উদ্যোগ পরিষদ

গঠন, গণশিক্ষা কেন্দ্র, নাট্যপ্রশিক্ষণ শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পথনাটিকা ইত্যাদির মাধ্যমে এলাকার মানুষকে সচেতন করার কাজ চলতো। নাট্যচর্চার বিষয়ে প্রয়াত নাট্যকার বাদল সরকার মহাশয় প্রভূত সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

এছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী সহায়তায় ও শ্রী প্রামাণিকের নেতৃত্বে জনকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে ৭৫০০ ধোঁয়াহীন চুল্লা তৈরী করা হয়েছে, ৪টি ব্লকে ৬৫টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, ৮৭৫টি পরিবারকে স্বল্পমূল্যে শৌচাগার করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে চলছে একটি কে.জি ও নার্সারী স্কুলও, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই দুঃস্থ পরিবারের। শ্রী প্রামাণিক ও তাঁর সংগঠন মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়েও কাজ করেন, এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা ১৯৮৫। এই প্রকল্পে আই.আই.এম.সি (সোনারগাঁ, সোনারপুর) সার্বিক সহায়তাদান করেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে স্বল্প সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্প, সঙ্গে বিবিধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। ৫০০ এর বেশি মহিলাকে তারা স্বাবলম্বী করেছেন। নিয়মিত ভাবে স্বাস্থ্য শিবির, প্রতিবন্ধীদের সাজ সরঞ্জাম বিতরণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বই বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়। তিনি মন্দিরবাজার ব্লকে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠাও করেছেন। ২০০৪ সালে সোনারপুরে একটি Text Book Library প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন ডঃ সুজন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সত্যব্রত চৌধুরী, অধ্যক্ষ গোকুল দাস, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সামাজিক এবং ধর্মীয় কুসংস্কার প্রতিরোধ ও রাস্তা এবং জলপথ সংস্কার করতে গিয়ে তিনি বহু রকমভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন, পুলিশ কেসের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু থেমে যান নি। করতে গিয়ে একাধিকবার পুলিশ কেস হয়েছে।

সমাজসেবার কাজে যুক্ত থাকার কারণে সঞ্জীব সরকার, রেভারেন্ড বিলাস দাস, সরল চ্যাটার্জী, বিপ্লব হামিল, সুকুমার সিং, অধ্যক্ষ সত্যব্রত চৌধুরী, ডাঃ সুজিত কুমার ব্রহ্মচারী, নাট্যকার বাদল সরকার, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে আসার তাঁর সুযোগ হয়েছে।

শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র প্রামাণিক ও তাঁর সংগঠনকে তাঁদের নিঃস্বার্থ সমাজসেবার জন্য আমরা 'বিপ্লব হালিম স্মারক সম্মান' জানাই ও তাঁদের ভবিষ্যতে সমস্ত সমাজ কল্যাণমূলক উদ্যোগের প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা।

“সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, প্রগতি
শান্তির পথ ধরে,
আমরা চলেছি, আমরা চলব
যুগ-যুগান্তর ধরে। ”

প্রকাশনা : ইমসে, ১৯৫ যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৮
ফোন : ০৩৩-২৪৭৩২৭৪০
ই-মেল: bipimse@hotmail.com / bipimse1974@gmail.com